পরিবর্তন মানে কী ?

সুধীর চক্রবর্তী

১৯৪২ সালে জাপানি বোমায় আতঙ্কিত হয়ে আমার বাবা সপরিবারে দিগনগড় তাঁর বাস্তভিটেয় মাথা গোজেন। তখন ঘোর বিশ্বযুদ্ধের রমরমা আর আর্থিক মন্দা। বাবা ঐ দিগনগর গ্রামের ক্ষয়িষ্ণুও জমিদারতন্ত্রের শেষ প্রতিনিধি যদিও অবস্থা বিপাকে তাকে নিতে হয়েছিল বৃটিশ সরকারের চাকরি। ইংরেজিনবিশ। তিনি টানা সতেরোবছর ছিলেন দিগনগর ইউনিয়ন বোর্ডর প্রেসিডেণ্ট। নিজের গ্রামকে প্রাণাধিক ভালোবাসতেন। দিগনগরে সে সময়ে ছিল প্রচণ্ড ম্যালেরিয়ার প্রকোপ, বহু পরিবার উজাড় হয়ে গিয়েছে। অনেকে পালিয়েছিল গ্রাম ছেড়ে। সমস্ত গ্রাম ঘন গহন জঙ্গালে ঢাকা,দিঘির পাড়ের জঙ্গালে বাঘ থাকত। সন্ধ্যের পরে ফেউ ডাকত। থম থমে রাতে, আলোহীন, যুদ্ধের ডামাডেলে কেরোসিন নেই। অশিক্ষা, দারিদ্র, আনাহার গ্রামের একটেরে একটামাত্র ইউ-পি স্কূল, মানে আপার প্রামমারি। ক্লাস ফোর- হলে বৃটিশ সরকার বাহাদুরের পক্ষে এসডি-ও সাহেব তাকে উপহার দিলেন একটা রুপোর কাটারি। মাসের প্রথমে বাবা আমাদের মতো ছোটোদের নিয়ে ছই লাগানো গোরুর গাড়িতে চেপে কৃষ্ণনগর আসতেন। পেনশন নিতে। গোরুর গাড়ি চলত ঢিমে তালে কেননা শান্তিপুর থেকে কৃষ্ণনগর পর্যন্ত রাস্তা ছিল কাঁচা। ফেরার পথে গোরুর গাড়ির নিচের দিকে একটা লণ্ঠন জ্বালা থাকত। অন্ধকারে পথে যেকো সময়ে বাঘ বেরোতে পারে। দিনের বেলাতেও এক এক জায়গায় গভীর অন্ধকার কেননা এত গাছের সমারোহ। জোড়া বটতলা বলে একটা জায়গায় গাড়ি এলে সতর্ক থাকতে হত- চারিদিক অন্ধকার - সেখানে নাকি ডাকাত আর ঠ্যাঙাড়েরা থাকে। এমন আজব দেশ থেকে আমরা পালিয়ে এসে ডেরা বাঁধি কৃষ্ণনগরের ধোপাপাড়ায়। ততদিনে পরিবারের ছোটোবড়ো সব সদস্য ম্যালেরিয়া আর কালাজ্বরে পর্যুদস্ত। তার ওপরে বারা মনে এই চিন্তা গ্রাস করল যে তাঁর ডাগর ডাগর ছেলেগুলো সব প্রাইমারি বিদ্যে পর্যন্ত পৌঁছে লেখাপড়া সাঙ্গা করতে বাধ্য হবে। কাজেই দিগনগর ত্যাগ। কৃষ্ণনগরে থেকেও তাঁর গ্রামপ্রীতি কিছুমাত্র কমেনি। তাই মাঝে মাঝে যেতেন ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে। দেখতেন বুঝতেন নি:শব্দ কিন্তু অনিবার্য গ্রামপতনের সংকেত। এরপরেই সার বেঁধে এসে গেল বৃটিশ পরিকল্পিত দুর্ভিক্ষ, উত্তাল অনাহার আর মৃত্যুমিছিল। গ্রাম সাফ হতে দেরি হল না। হঠাৎ দেশভাগ হয়ে দেশে এসে গেল নানা পরিবর্তনের ঝাপট। তৈরি হল পাকা রাস্তা সিমেন্ট দিয়ে, চালু বাসরুট, স্কূলটা উন্নীত হল জুনিয়র হাই পর্যায়ে - আর দিকে দিকে জঙ্গাল কেটে গড়ে উঠল উদ্বাস্তুদের টিনের চালা দেওয়া বাড়ি আর টিউবওয়েল। উদ্যমী আর কর্মঠ এবং লড়াকু জনসমাজ নতুন দিগনগর গড়তে লাগল।

বাবা ততদিনে অশীতিপর, তই নিজে আর যেতে পারেন না স্বগ্রামে। ইউনিয়ন বোর্ডও হাতছানা হয়ে গেছে। কথায় কথায় বলে রাজা কর্ণেন পশ্যতি, অর্থাৎ কিনা রাজার কাছে সব কথা পৌঁছে যায় কানে কানে। গ্রামের দফাদার প্রতি মঙ্গালবার কোতয়ালি থানায় বাধ্যতামুলক হাজরে দিয়ে গ্রামের আইন শৃঙ্খলার খবর পেশ করে চলে আসত আমাদের বাড়ি। বলত বুঝলেন বাবু, আপনারা সব বাবুরা তো পালিয়ে এলেন গেরাম ছেড়ে আর আমরা সব হয়ে গেলাম কাবু। ভাবলাম বুঝী আর আমরা বাঁচব না। তারপরে দেশভাগ হয়ে যায় আর বাস্তহারারা এসে দিগনগরের চেহারাইপালটে দিল। ওরা তো আমাদের সাবেক লোকদের মতো আলসে নয়, খুব খটিতে পারে আর মেয়েপুরুষে কাজ করে। আর — সত্যি কথা বলব বাবু ওদের হাতে কী একটা জাদুকাঠি আছে, তই দেখি আমাদের মাটির ঢেলা ভরা পতিত জমিতে সম্বচ্ছর এখন কিছুনা কিছু ফসল ফলছে। তইওদের সচলেতা অনেক বেশি। রোজ সন্ধেকালে হরিসংকীর্তন হচ্ছে আর

গেরামের সব কাজে ওরা ঝাঁপিয়ে পড়ে। দিঘিতে এখন সমবায় প্রথায় মাছ চাষ হচ্ছে। নানারকম রিলিফ আর লোনের টাকা তো গরমেন্ট ঢেলে দিচ্ছ। আমরা শুধু সেই একইরকম রয়ে গেলাম।

বাবা উদ্ভাসিত মুখে সব শুনে বলেন, বাঃ,আবার তাহাল দিগনগরের কপালে সুদিন এসে গেল। এখন নাকি সারাদিন বাস চলছে? তাতে কী লাভ হল বলো তো ?

-আমরা বাবু মুরুখ্যু মানুষ, আপনি হলেন মুরব্বি, তা আপনিই নাহয় বুঝিয়ে বলুন।
- ব্যাবসা বাড়বে, শহর থেকে মাল আসবে লরিতে চেপে, ক্রমে দেখবে দিগনগরে এসে যাবে ইলেকট্রিক। তারপরে ধরো ছেলেপিলেরা বাসে করে শান্তিপুরে কেষ্টনগরে গিয়ে বড়ো ইস্কুলে-কলেজে পড়তে পারে। জানো তো আমাকে কি করতে হায়েছিল? ভাতজাংলায় মামার বাড়ি থেকে, মেজোমামা আর সেজোমামার সঙ্গে কেষ্টনগরের সি.এম.এস স্কুল আর বড়ো কলেজে পড়তে যেতাম, হেঁটে যাওয়া আর হেঁটে আসা, অতখানি রাস্তা, ভাবতো পারো? দেশ এখন স্বাধীন, হয়েছে। বড়ে পরিবর্তন হবে, বেঁচে থাকবে তোমরা, কত সব দেখবে। আমাদের যুগ শেষ, তা এখন বলো দিকি, পাকা রাস্তায় যে বাসস্টপ হয়েছে সেখানে নাকি কী সব দোকান হয়েছে ?

হাঁ বাবু, ধরেন কয়লার ডিপো।
আর, বলো কি ? দিগনগরের লোকেরা কয়লার উনুনে রান্না করছে? আর কী পরিবর্তন দেখছ ?
মেয়েরা দোকান বাজার করছে। এখন ভো আর সাপ্তাহিক হাট নেই। রোজ বাজার বসে। তবে কি জানেন, বর্ষাকালে রাস্তায় কাদা আর পেছলভাব একইরকম আছে। ও হ্যা, একটা কথা বলতে বুলে গেছি, গ্রামের কাছেপিঠে দুচারখানা মোটর সাইকেল দেখা যাচ্ছে আজকাল। আর একটা নতুন জিনিস দেখছি। বাথানগাছিতে একজন ডাক্তার হয়েছে। কোয়াক না কী যেন বলে, সেই তো যাহোক একরকম চিকিচ্ছে করে আমাদের বাঁচাচ্ছে। বড়ো কিছুহলে ভরসা শান্তিপুরের হাসপাতাল।

এতক্ষণের বৃত্তান্তে পাঠক বুঝতে পারছেন একটা প্রায় মরণোন্মুখ গ্রাম সমাজ কীভাবে আবার চাঙ্গা হয়ে উঠতে পারে। বাবা কবে চলে গেছেন। দিগনগরে কয়লার ডিপো হায়ছে শুনে চমকে উঠেছিলেন। এখন তাঁকে সেখানে নিয়ে গেলে চোখ বিস্ফারিত করে দেখতেন একটা পুরোদস্তুর উচ্চমাধ্যমিক আর মেয়েদের জন্য মাধ্যমিক রমরমিয়ে চলছ। কাছেই রয়েছে একটা পেট্রলপাম্প। দোকানে পাওয়া যাচ্ছে ঠাণ্ডা দই অর কোল্ডড্রিংক্স্। দিগনগর স্টেশন দিয়ে চলছে ইলেকট্রিক ট্রন। সুতোর দোকান, কাঠের আসবাব, বস্ত্রালয়, ক্যাসেটের দোকান এমনকি কম্পিউটার।

দিগনগরের সেকাল-একাল এই মর্মে একটা মাইক্রো সার্ভে করলে এমনই একটা প্রতিবেদন গড়ে উঠবে। এটা একটা উধাহরণ মাত্র। দেশে পরিবর্তনের যে ছাপ সর্বত্র চোখে পড়ে তার কিছু নমুনা আমাদের আড্ডার দেবেশ সেন সেদিন আড্ডায় বললেন। তাঁর বচন ছিল এইকম যে, আপনারা তো বেশিরভাগ ঘরে বসে রাজা-উজির মারেন আর আমি সেলস্এর কাজে ঘুরি মোটর সাইকেলে। না না, চাকরি নয়, আমার নিজেরই একটা প্রোডাক্ট আছে- সেইটার সেলস-প্রমোশনে নানা জায়গায় যেতে হয়। ন্যাশনাল হাইওয়ে ধরে যাই প্রথমেই যে পরিবর্তন চোখে পড়ে তা হল প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনা। যেমন ধরা যাক বড়োজাগুলি পেরিয়ে বা দিকে একটা এরকম সড়ক আছে, যা দিয়ে পৌছে যাওয়া যাবে

হাবরা অশোকনগর হয়ে বনগাঁ বর্ডার। ভাবা যায়? সেখানে একটা বাসরুট পাবেন - গাইঘাটা টু বারাকপুর - আশ্চর্য ব্যাপার। এরকম অনেক নতুন সড়ক হয়েছে। তারপরে পথে যেতে যেটা চোখে পড়ে সেই বড়ো বড়ো হোর্ডিং থেকে জানা যায় দেশে নির্মাণকাজ বা কনট্রাকশন জাতীয় ব্যাপার ব্যাপক চলছে। কী করে বুঝি বলুন তো?
-ঐ তো বললেন, হোর্ডিং দেখে। তো কীসের হোর্ডিং?
- সব কটা সিমেন্ট কোম্পানির। আর একটা জিনিস চোখে পড়ে। হাইওয়েতো অনবরত কয়েকটা ছোকরা যন্ত্রপাতি নিয়ে রাস্তা মাপজোক করছে আর বড়ো বড়ো গাছ কটা হচ্ছে। কারণ জাতীয় সড়ক ফোর লেনের হচ্ছে। এতে জামজট কমবে আর কলকাতা থেকে আসাম পরিবহন দ্রুত হবে। আরও বাস নামবে পথে। জানেন তো, এখন অনেক Volvo বাস চালু হয়েছে যা বিলাসবহুল আর এসি। এতে কী বুঝছেন?

-লোকের স্বচ্ছলতা বেড়েছে এবং স্ট্যাণ্ডার্ড অব লিভিং। অবশ্য সেই সঙ্গে আর একটা জিনিস কি চোখে পড়েছে আপনার ? প্রচুর সোনার কোম্পানি বা জুয়েলার্সদের বিজ্ঞাপন সমস্ত বড়োরাস্তা জুড়ে ?

-তার মানে এখন লোকে সোণার ব্যবসায় লগ্নি করছো। কিন্তু স্প্রেড অব এডুকেশন তার পাশে দেখছেন না।
- উরে বাপরে, সারাপথে দেখবেন ছেলেমেয়েরা দল বেঁধে চলেছে স্কুলে আর কলেজে। তাদের সকলেরই কাঁধে একটা করে ব্যাগ। ভাবা যায়? উত্তর ২৪ পরগণা আর নদিয়া-মুর্শিদাবাদে আর একটা জিনিস দেখবেন - মুসলমান মেয়েদের মধ্যে লেখাপড়ার যেন ঢল নেমেছে। আর এই সমস্ত লেখাপড়ার কাজে পরিবহণের সূত্র হল ভ্যান রিকসা। সারা দেশে হাজার হাজার ভ্যান চলে -নগদ পয়সার জীবিকা আর স্বাধীন জীবন।

-আমি আরেকটা কথা বলতে পারি। মেয়েদের জীবিকা-জীবন। দেখতে পারেন গ্রামের বউরা ধান সেদ্ধ করছে, উঠোনে ধান শুকোচ্ছে, তাঁতের শাড়ির সুতো গোটাচ্ছে লাটাইয়ে -এ দৃশ্য বাড়ি বাড়ি দেখবেন। আর দেখবেন হয়তো রাজমিস্ত্রি কাজ করছে আর তার যোগালের কাজ করছে একজন নারী। অপরূপ সুন্দর দৃশ্য। আগে দেখা যেত না।

-আসলে নারীমুক্তি বলে একটা কথা ছোটোবেলা থেকে আমাদের কানে যাচ্ছে কিন্তু তার ফলিত রূপ মা-মাসিদের আমলে আমরা দেখিনি, দিদি-বৌদিদের কালেও নয়। গত শতকের আশি নব্বইয়ের দশক থেকে নারী আর নারীমুক্তি আর নারী জীবিকার অনেকগুলি মুখ খুলে গেছে। মানবী-বিদ্যাচর্চা এখন একটা পড়াশুনার সাবজেক্ট। দেশে উইমেন্স কমিশন তৈরি হয়েছ। দেশের রাষ্ট্রপতি একজন নারী, অন্তত তিনচারজন নারী মুখ্যমন্ত্রী আমর দেখছি। একাধিক মুসলিম নারী সভাধিপতি পঞ্চায়েত প্রশাসন দিব্যি চালাচ্ছে। প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য একজন যোগ্য মহিলা। শারদীয় দুর্গোৎসবে মহিলা পরিচালিত বারোয়ারি সংগঠন এখন আকছার। সুষ্ঠুভাবে পুজো করিয়ে, তিনদিনের মহাভোজ সামলে, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা আর দীন দুঃখীদের বস্ত্র বিতরণ- পর্ব সেরে সেই নারীবাহিনী যখন দল বেঁধে প্রতিমা বিসর্জন দেবার সময় বাজনার তালে তালে একটু নাচেন তবে আমাদের জ্যাঠামশইমার্কা পুরুষেরা এত ভুঁরু কোঁচকাবার কারণ কী?

আলোচোনা বেশ গরম গরম স্বাদের হচ্ছে এবংখুব জমে গেছে দেখে আমি সুযোগ বুঝে বলে বসলাম, -পরিবর্তনের গায়ে গায়ে কিন্তু ডেভেলপমেণ্ট বলে একটা তত্ত্ব আছে। ডেভেলপমেন্ট মানে হিউম্যান ডেভেলপমেণ্ট অর্থাৎ

মানবপ্রকর্য। মানবপ্রকর্ষের একটা প্রধান লক্ষণ হল মানুষের সর্বাঙ্গীন স্বাধীনতা। তারমাধ্যেমে প্রধান স্বাধীনতা হল মুক্তবুদ্ধির। তার মানে কী ?

দেবেশ সেন যেন মুখিয়ে ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, চিন্তার স্বাধীনতা। এ সম্পর্কে একজন মুক্তিবুদ্ধির মানুষের উক্তি আমি মুখস্ত করে রেখেছি। শুনুনঞতুছ্টূয্ — freedom is always the freedom of those who think differently. But those others what do they think about? And free in this thinking? —এ প্রশ্নের কী জবাব দেবেন আপনারা ?

আড্ডায় মেজাজ ভারী হয়ে উঠল। বেশ শুরু হয়েছিল হাল্কা চালে কিন্তু হঠাৎ তার সুর এমন পড়ে গেল যে সকলেই কেমন গম্ভীর হয়ে তাকিয়ে রইলেন অসহায়ভাবে। তখন বাধ্য হয়ে আমাকে। জমায়েতের রাশ নিজের হাতে নিয়ে বলতে হল, খুব পুরোনো একটা কথা বলতেপারি। কথাটা রবীন্দ্রনাথের। তিনি বলেছিলেন, স্বরাষ্টের সবচেয়ে বড় শক্তি হল পৌরুষ আর তিনি ভাবনার সবচেয়ে বর শক্তি হল স্বভাষার অবিকার। আমাদের চিন্তা স্বাধীনতা আর- চিন্তা ভাষার পরিবর্তনই দরকার সবচেয়ে আগে। আমরাকি কেউ মাতৃভাষা শুদ্ধভাবে খানিকক্ষণ বলতে পারি বা লিখতে পারি? পারি না। কারণ হল বঙ্গাসংস্কৃতিতে নানাভষার মিশ্রণ এসে গেছে, ফলে আমাদের চিন্তা ভাষাও খুব একটাপরিচ্ছন্ন নয়। তাহলে মূলকথা কী দাঁড়াল ? পরিবর্তন মানে কী ? বড় বড় কনস্ট্রাকশন, শিক্ষার প্রসার, বেতনবৃদ্ধি, নারীপ্রগতি, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উন্নিত বা দলিতদের সান্ত্বনা দান ?

কেউ কিছু বললেন না। বস্তুত বলবার মতো কিছু নেইও। সমাজের অবক্ষয়ী স্রোত, মানুষের মতিগতি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গোলযোগ, বিনা কারণে হত্যা ও রক্তপাত, হঠাৎ হঠাৎ দুর্নীতি ধরা পড়া, নেতাদের রংবদল ও দলদাসদের হম্বিতম্বি- সবই সমাজবিজ্ঞানের একটা তত্ত্বে স্পষ্ট ব্যাখ্যা করা যায়। সমাজতাত্ত্বিক আন্দ্রে বেতেই যাকে বলেছিলেন, ‘unintended consequences’-কেউ চায় না অথচ য়া হবার নয় তাই হয়ে যাচ্ছে। একে রুখতে পারলে পরিবর্তন আসবেই।